European Union's Thematic Programme for Environment and
Sustainable Management of Natural Resources, Including Energy

**Collective Action to Reduce Climate Disaster Risks and Enhancing Resilience of the Vulnerable Coastal Communities Around the Sundarbans in Bangladesh and India**

**Contract No. DCI-ENV/2010/221-426**

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

# সুন্দরবনের পুকুরে মিঠে ও নোনা জলে : মাছ চাষ

Funded by

European Union

Implementaion

Bangladesh

India

Supported by

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

# সুন্দরবনের পুকুরে মিঠে ও নোনা জলে : মাছ চাষ

প্রথম প্রকাশ : ২০১৩

© ডি আর সি এস সি

**সম্পাদনা** সুব্রত কুন্ডু

**রচনা** ড. প্রতাপ মুখোপাধ্যায়
পূর্বতন শীর্ষ গবেষক
সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব
ফ্রেশ ওয়াটার অ্যাকোয়াকালচার (CIFA)

**প্রচ্ছদ** অভিজিত দাস || **হরফ** শিপ্রা দাস
|| **রূপ** শিপ্রা দাস
অর্থ-সহযোগ : European Union
|| **ছবি** ডি আর সি এস সি

মুদ্রক ও প্রকাশক :
সোমজিতা চক্রবর্তী
ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার
৫৮ এ ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২

# প্রাক্‌কথা

ডি আর সি এস সি গত তিরিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে পিছিয়ে পড়া মানুষের সঙ্গে খাদ্য ও জীবিকার নিরাপত্তার লক্ষ্যার্থে বিশেষভাবে কাজ করে চলেছে। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সুন্দরবনের উপকূলীয় অঞ্চলের বিপদাপন্ন মানুষের জীবিকাকে বেশি মাত্রায় প্রভাবিত করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি সহনশীল বিকল্প জীবিকা হিসাবে স্থানীয় প্রজাতির মাছ চাষ বিপদাপন্ন মানুষগুলির পরিবারের পুষ্টি ও আয়ের বিকল্প উৎস হতে পারে। আমরা আমাদের এই বইতে স্থানীয় প্রজাতির মাছ চাষের কথা, মাছের রোগ নিরাময়ের উপায়, মাছ চাষে সরকারি সাহায্যের কথা এবং আরো অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস যদি সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের সাহায্যে আসে তাহলে আনন্দিত হব।

সোমজিতা চক্রবর্তী
সম্পাদক
ডি আর সি এস সি

আমাদের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা পুকুরগুলোকে যতটা সম্ভব সংস্কার করে যদি কিছুটা পরিকল্পিতভাবে মাছ চাষ করা যায় তাহলে একসাথে আর্থিক লাভ, পুষ্টির চাহিদা পূরণ আর গ্রামে কাজের সৃষ্টি নিশ্চিত হয়। এজন্য দরকার একটু উদ্যোগী হয়ে মাছ চাষের পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে কিছুটা জেনে ও বুঝে নেওয়া। সামান্য প্রশিক্ষণ আর সরকারি/বেসরকারি সহায়তা/পরিষেবা ব্যবহার করে গ্রামের অনেক মানুষ এভাবে স্বনির্ভর হতে পারেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে ভালো অর্থাৎ স্বাস্থ্যবান বীজ (মাছের চারা) সংগ্রহ, মজুত করা চারাকে নিয়মিত সাধারণ কিছু খাবার জোগান আর সামান্য তদারকি ও পরিচর্যাই হল মাছের ভালো ফলনের মূল কথা। যদি নতুনভাবে পুকুর খুঁড়ে এই কাজে কেউ এগোতে চান তাহলে বর্ষার প্রারম্ভেই তা করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে উদ্ভিদজাত সার (যা সবুজসার নামেই পরিচিত) যেমন ধনচে, মটর প্রভৃতি শুঁটিজাতীয় গাছকে

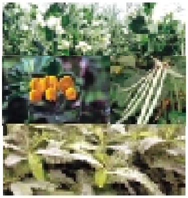

পুকুরের তলদেশে লাঙল দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এতে বৃষ্টির জল জমলে সহজেই মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যকণা জন্ম নেবে অল্প দিনের মধ্যেই ও পুকুর মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

**পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি :**

মাছ চাষের জন্য নির্বাচিত পুকুরে ৮ থেকে ১০ মাস জল থাকা দরকারই। গভীরতা ৬ ফুট, ক্ষেত্রফল মোটামুটি ৫ থেকে ১৫ কাঠা (৮-২৫ শতক) বা তার বেশি থাকবে, আকারে আয়তাকার যা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আর পূর্ব-পশ্চিমপাড় বড় গাছ বর্জিত হলে ভালো হয়; অর্থাৎ পুকুরে আলো বাতাস যেন খেলতে পারে তা নিশ্চিত করা। কায়িক শ্রম প্রয়োগে পুকুরে অপ্রয়োজনীয় জলজ উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ও যদি কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাব বেশি থাকে তা একাধিকবার চটজাল টেনে তাকেও নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। পুরোনো পুকুরে হাইব্রিড মাগুর (আসলে নাম আফ্রিকান মাগুর), বোয়াল, শোলজাতীয় মাছ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে তা অবশ্যই তুলে নিতে হবে কারণ এই শিকারি মাছগুলি ব্যাপকহারে পোনা মাছ খেয়ে ফেলে। এই কাজটা একাধিক বার জাল টেনে করা যেতে পারে আর যদি কেউ মহুয়া খোল প্রয়োগ করে তা করতে চান সেক্ষেত্রে বিঘাপ্রতি ৩০০ কেজি হিসাবে প্রয়োগ করলেই হবে — মহুয়া খোল প্রথমে বিষক্রিয়া ঘটালেও আনুমানিক একুশ দিন পরে তা উত্তম সারে পরিণত হয় এবং পুকুরের উর্বরতা বাড়ায়। যেহেতু মহুয়ার বিষদোষ প্রায় তিন সপ্তাহ থাকে তাই ওই সময়ে পুকুরে পোনা মজুত করা যাবে না। পুকুরের পাড় দরকার মতো সংস্কার করে নিতে হবে (পাড়ের ঢাল ৪৫° মত হবে) যাতে শক্ত ও উঁচু থাকে। ইচ্ছে মতন সেই

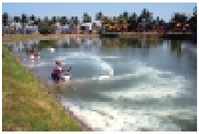

জায়গায় মরশুমি শাক সবজি ফলানো সম্ভব। এতে খাদ্য সুরক্ষা কিছুটা হয় আর বাড়ে পুকুরের সুরক্ষা।

পুকুরের উর্বরতা বজায় রাখতে বিঘা প্রতি মাসে ১০০ কেজি হারে গোবর সার প্রয়োগ করা দরকার। এর দ্বারা জলে উদ্ভিদ কণা ও প্রাণী কণার ভারসাম্য বজায় থাকবে। কিন্তু সার প্রয়োগের আগে চুন (বিঘা প্রতি ২০ কেজি হিসেবে) দিয়ে নিতে পারলে ভালো হয়। এতে জলে প্রয়োজনীয় ক্ষারকীয়তা (৮০ থেকে ১৫০ পি.পি.এম) বজায় থাকবে ও জল রোগ-জীবাণু মুক্ত থাকবে। সরাসরি চুন না দিয়ে জলে ভিজিয়ে ঠান্ডা করে দিয়ে সেই গোলা জল সারা পুকুরে সমান ভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। এইভাবে পুকুর তৈরি করে নিতে পারলে (স্বচ্ছতা ৩০-৩৫ সেমি; অক্সিজেন ৫-৮ পি.পি.এম; পি.এইচ ৭.৫-৮.০)মজুত করা মাছ ভালো থাকবে। প্রতি দু তিন মাসে পুকুরের তলদেশ একবার আঁচড়ে দিতে হবে — এতে জল দূষিত গ্যাস মুক্ত হবে আর মাছ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে এবং রোগ জীবাণু মাথা চাড়া দিতে পারবে না।

**মাছের প্রজাতি নির্বাচন ও পোনা মজুতকরণ :**

মাছের প্রজাতি বাছাই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন পোনা মাছ (যেমন কাতলা, রুই, মৃগেল, কালবোস, বাটা ইত্যাদি) যা পুকুরের প্রাকৃতিক পরিবেশে তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে, প্রাকৃতিক ও পরিপূরক খাবার সহজে

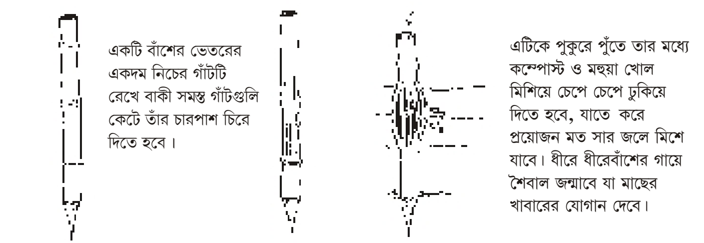


জলে প্ল্যাঙ্কটন বৃদ্ধির একটি সহজ উপায়।

গ্রহণ করে, সর্বোপরি পুকুরে উৎপন্ন প্রাকৃতিক খাবার নিয়ে কেউ কারও প্রতিযোগী হয় না, তাই মিশ্র চাষের উপযুক্ত হিসেবে অগ্রাধিকার পাবে অর্থাৎ সব মিলিয়ে লাভজনকও হবে।

সারণী - ১

| মাছের প্রজাতি | পছন্দের প্রাকৃতিক খাবার | পুকুরের যে স্তরে সাধারণত থাকতে অভ্যস্ত |
|---|---|---|
| কাতলা | প্রাণীকণা | উপরিস্তর |
| সিলভারকার্প | সবুজকণা | উপরিস্তর/মধ্যস্তর |
| গ্রাসকার্প | জলজ উদ্ভিদ (ঝাঁঝি, ঘাসপাতা) | মধ্যস্তর |
| রুই | শৈবাল জাতীয় কণা/প্রাণীকণা | মধ্যস্তর |
| মৃগেল/ আমেরিকান রুই | প্রাণীকণা, পচে যাওয়া জৈব পদার্থ ইত্যাদি | তলদেশ |
| কালবোস,বাটা | প্রাণীকণা, বিভিন্ন লার্ভা, জৈব পদার্থের সমন্বয় | মধ্যস্তর/নিম্নস্তর |

সাধারণভাবে উপরিস্তর, মধ্যস্তর ও নিম্নস্তরের মাছ ৪ঃ৩ঃ৩ অনুপাত ছাড়া যেতে (সাইজ চার ইঞ্চির কম না হওয়া) পারে। তবে কেউ আদর্শগতভাবে নিয়মমাফিক চাষ করতে চান তখন কিন্তু তিন রকমের পুকুর প্রয়োজন হবে - আঁতুড় পুকুর, পালন পুকুর ও সঞ্চয়ী পুকুর। ডিম-পোনা (১০০ মিগ্রা মতো প্রতিটির ওজন) ধানী পোনাতে (ওজন ৩০০ থেকে ৫০০ মি.গ্রা.) রূপান্তরিত করতে দরকার হয় আঁতুড় পুকুর। এই পুকুর ছোট আকারে হয় ও গভীরতা কম থাকে। ধানী পোনা থেকে চারা পোনা করতে চাই পালন পুকুর। এই পুকুর অপেক্ষাকৃত আকারে বড় ও গভীরতা একটু বেশি। চারাপোনা থেকে বড় পোনার জন্য দরকার সঞ্চয়ী পুকুর। যা আরও একটু বড় হবে ও গভীরতাও বেশি থাকবে। মাছ পুকুরে ছাড়ার আগে জলের তাপমাত্রা দেখে নিতে হবে। ২৫° সেন্টিগ্রেড কাছে থাকলে ভালো হয়। যেহেতু সকালের দিকে বা সন্ধ্যের সময়ে জলের তাপমাত্রা কমের

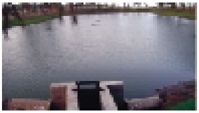

দিকে থাকে তাই এই সময়টা মাছ ছাড়ার জন্য বেছে নিলে ভালো হয়। যদি হাঁড়িতে মাছ আনা হয় তাহলে ধীরে ও ধৈর্য্য সহকারে মগ বা কোনো পাত্রের সাহায্যে পুকুরের জল অল্প পরিমাণে মেশাতে হবে যাতে দুই জলের মধ্যে তাপমাত্রার একটা সামঞ্জস্য আনা যায়। পরে হাঁড়ির মাছকে পুকুরের জলে ছাড়তে হবে ধীর লয়ে। মনে রাখতে হবে ভালো চারাপোনা কিন্তু সহজে পাওয়া যায় না। তাই আগে থেকে কাছাকাছি কোনো সরকারি স্বীকৃত হ্যাচারীর সাথে যোগাযোগ করে সেখান থেকে চারা সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। যেহেতু এই সমস্ত হ্যাচারীতে বাছাই করা বড় পুষ্ট মাছ দিয়ে প্রজনন করানো বীজ পাওয়া যায় তাই গুণগত মান সম্পর্কে চিন্তার তেমন কারণ থাকে না বিশেষত, যখন এই চারাও শোধন করে প্রয়োজনে অক্সিজেন প্যাকিং করে সেখান থেকে দেওয়া হয়। মাছের দ্রুত বৃদ্ধির সময় হল মে মাস থেকে অক্টোবর মাস ওই সময়ে জলের তাপমাত্রা ২৮°-৩১° সেন্টিগ্রেড থাকে আর জলে প্রাণীকণা/সবুজকণা একটা সুন্দর ভারসাম্য থাকে।

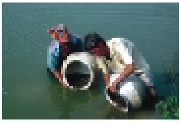

**পরিপূরক খাবার যোগান :**

মাছ ছাড়ার তিনদিন পর থেকেই খাবার জোগান একান্ত জরুরি। এই জন্য প্রয়োজনীয় অণুপাণ সংগ্রহ করে চাষি নিজেই তা সহজে তৈরি করতে পারেন। তুষবিহীন মিহি করে গুঁড়ো করা চালের কুঁড়ো ও বাদাম খোল (১ঃ১ অনুপাতে) ও সঙ্গে স্থানীয় দোকানে প্রাপ্ত গবাদি পশুর উপযুক্ত ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ (কিলো প্রতি খাবারে ১০ গ্রাম মতো) ভালো করে

জলে অক্সিজেন বাড়ানোর একটি সহজ উপায়–

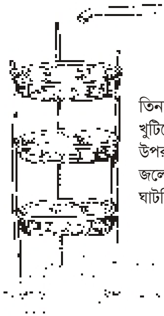

তিনটি ঝুঁড়ি এইভাবে খুটিতে বেধে তার উপর জল ছাড়লে জলে অক্সিজেনের ঘাটতি কমানো যাবে।

মিশিয়ে ঈষদুষ্ণ জলের সাহায্যে (কেজি প্রতি খাবার তৈরিতে ৩০০ থেকে ৩৩০ মিলি লিটার জল লাগে) মেখে নিয়ে আটার তালের মতো দলা বানিয়ে তারপরে সেটাকে ঘরোয়া সেমাই মেশিনের সাহায্যে (দাম ৩০০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে) নুডুলস আকারে বানিয়ে, রোদে শুকিয়ে চটের ব্যাগে রাখতে হবে (এ কাজটা কদিন আগেই সেরে রাখা ভালো) তারপর রোজ দুবার করে (সকাল ৮টা এবং বিকেল তিনটে নাগাদ) নির্দিষ্ট জায়গা থেকে দিতে হবে। দৈনিক খাবারের পরিমাণ সাধারণত পুকুরে মোট মাছের ওজনের শতকরা পাঁচ ভাগ হয় যা দুবারে ভাগ করে দিতে হবে, তবে খাবরের পরিমাণের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে - যেমন একটানা মেঘলা আবহাওয়া থাকলে কম খাবার দিতে হবে আবার রৌদ্রজ্বল দিনে পরিমাণ বাড়বে। খুব সহজে হাতের তালুতে চালের কুঁড়ো বা বাদাম খোল রেখে ঘ্রাণের সাহায্যে আমরা সহজে বুঝে নিতে পারি যে উপাদানগুলো টাটকা কিনা। বহুদিনের গুদামজাত হলে গন্ধই অন্যরকম হয়ে যায়। এভাবে দেখে বা বিশ্বস্ত কোনো দোকান থেকে সংগ্রহ করে তবেই মাছের খাবার বানানো উচিত। সস্তায় কেনা খারাপ হয়ে আসা উপাদান যেন ব্যবহার না করা হয়।

ভালো খাবার দেওয়ার লাভ দুটো - এক মাছ বাড়ে তাড়াতাড়ি আর দুই পুকুরে জল থাকে নির্মল।

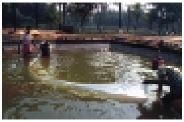

দেখা গেছে খাবারে সামান্য রদবদল করলে যেমন বাদাম খোলের পরিবর্তে তিল খোল বা সরষের খোল বা খুব সামান্য পরিমাণে সাধারণ কিছু ভেষজ উপাদান যেমন শুকনো মেথি ভাজা গুঁড়ো ও একাঙ্গীর গুঁড়ো (কেজি প্রতি খাবারে ২০ গ্রাম মতো দিলেই চলবে) বাড়তি

একটু মিশিয়ে দিলে মাছের খাদ্যগ্রহণ পলকেই অনেক বেশি হয় আর ফলে বৃদ্ধিও বেশি পরিলক্ষিত হয়। গ্রামাঞ্চলে মাছের খাবার তৈরিকে অনায়াসে ব্যবসা হিসাবে নেওয়া যায়। মাছ নিয়মিত খাবার খাচ্ছে কিনা সেটা দেখা দরকার। মাছের বয়স, ঋতু ও চাহিদা অনুসারে খাবারের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। প্রতি মাসে একবার জাল টানা দরকার এতে মাছের ব্যায়াম হয় ও মাছ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। মাছ ধরার পর জাল পরিষ্কার জলে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে রাখা দরকার। দেখতে হবে যেন জালে পাঁক বা কাদামাটি লেগে না থাকে, তারপর আলো বাতাস যুক্ত জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে। মাসে একবার করে জলে প্ল্যাঙ্কটন নেটের সাহায্যে ৫০ লিটার জল ছেঁকে নিয়ে দেখতে হবে যে প্রাণীকণা ১.০ থেকে ১.৫ মিলি বা তার সামান্য বেশি আছে কিনা। জল যেন ফিকে না হয়ে যায় এটা লক্ষ্য রাখতে হবে। কখনও কখনও জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায় – তখন বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা করতে হয় – পাম্পের সাহায্যে। এতে জলের বিশুদ্ধতা বজায় থাকে আর মাছের স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। নমুণায়নের মাধ্যমে মাছের বাড়ের হিসেব প্রথম থেকে খাতায় লিখে রাখতে হবে তারিখ উল্লেখ করে। প্রথম থেকে মাছ তুলে ফেলা পর্যন্ত এইরকম নথিভুক্ত করে খাতায় রাখতে হবে। মজুত করার ৬-৭ মাস পরে যখন মাছ ধরা হবে তখন মাছের গড় ওজন হবে প্রায় ৮০০ গ্রাম এবং হেক্টর প্রতি ৩০০০-৪০০০ কেজি মাছ উৎপাদন হবে।

ঝুড়িতে খাবারের মন্ড দেওয়া হলে তার ভারে ঝুড়িটি পুকুরের জলে ডুবে যাবে।মোটামুটি ৩০ মিনিটের মধ্যে খাবার শেষ হয়ে গেলে বুঝতেহবে মাছেদের স্বাস্থ্য ভাল আছে।

**রোগ বালাই প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা :**

পুকুরে মাছ নিয়মিত খাবার যদি খাওয়া বন্ধ করে দেয়, যদি দেখা যায় কোনো মাছ পুকুরে ভেসে উঠেছে বা ঘুরপাক খাচ্ছে অথবা কোনো মাছের পাখনা খসে গেছে, পুকুর পাড়ে গা ঘষছে তাহলে তখনই রোগের সংক্রমণ হয়েছে বলা যায়। শুরু থেকে তাই নিবারণের জন্য সচেতন হতে হবে নতুবা এরকম অবস্থায় এলে উৎপাদন অত্যন্ত ব্যাহত হবে কারণ চিকিৎসাতে বিশেষ লাভ হয়না। সাধারণত যে সমস্ত রোগ দেখা দেয় তারমধ্যে সন্ধিপদ প্রাণী বা উকুনের আক্রমণ, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ উল্লেখযোগ্য। উকুন থেকে প্রতিকারের একটা উপায় হল পুকুরের পার বরাবর কয়েকটা নারকেল গাছের পাতা সমেত ডাল জলে সামান্য ডুবিয়ে রাখা। উকুন এই পাতায় অজস্র ডিম পাড়ে যা দু তিন অন্তর তুলে রোদে শুকিয়ে নিলেই ডিম নষ্ট হয়ে যায় আর উকুন বংশবিস্তার করতে পারে না। ছত্রাক ও ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত রোগ নিরাময়ে একটা ঘরোয়া টোটকা ওষুধ হলো খানিকটা কাঁচা হলুদ, কচি নিমপাতা ও কয়েক কোয়া রসুন (একটু থেঁতো করে) একসাথে সামান্য খাবার লবণের সাথে মিশিয়ে পেষ্ট করে সপ্তাহে একবার করে পুকুরে ছড়িয়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। ব্যাঙাচি নিয়ন্ত্রণে পুকুরের ভেতরদিকের পাড়ে ছাই ছড়িয়ে দিলে ফল পাওয়া যায়। কোনো সময়ে যদি জলের অম্লত্ব বাড়ে (পি এইচ ৭.০-এর কম) তখন কলাগাছ কুচি করে কেটে পুকুরে ছড়িয়ে দিয়ে দিন দুই পরে তুলে নিলে অম্লত্ব থাকে না। আবার যদি কোনো কারণে ক্ষারত্ব বেড়ে যায় (পি এইচ ৮-এর বেশি) তখন তেঁতুলপাতা সমেত ডাল ফেলে দিলে কাজ হয়। পোকার উৎপাত বেড়ে গেলে পুকুরে কিছু ফলুই মাছের চারা ছাড়া যেতে পারে। অনেক সময় মাছ অপুষ্টিজনিত কারণেও রোগাক্রান্ত হয় - তখন শরীরের তুলনায় মাথা বড় দেখায়, মাছ দুর্বল হয়, স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য চলে যায় এবং এ সময়ে জলে খাদ্যকণারও ঘাটতি দেখা যায়। সামান্য সার প্রয়োগ ও সঙ্গে সার্থক পরিপূরক খাবার জোগান ও প্রয়োজনে মাছের

সংখ্যা যদি বেশি থাকে তাহলে কিছু কমিয়ে দেওয়া। চাষিকে সতর্ক থাকতে হবে পূর্বলক্ষণ দেখা মাত্রই তা বিহিত করার উদ্যোগ নেওয়া। পূর্বলক্ষণের একটি হল খাদ্যগ্রহণে অনীহা যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

## মাছচাষের সহায়তা প্রকল্প

### এই প্রকল্পগুলির মধ্যে

ক। নতুন খামার স্থাপনের (বাগদা/গলদা চাষের খামার) জন্য ক্যাপিটাল বিনিয়োগের শতকরা ২৫ ভাগ অনুদান প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে চাষিকে MPEDA (Marine Products Export Development Authority, Ultadanga, Kolkata-700 054)-র নথিভুক্ত হতে হবে। খামারে জল/মাটি পরীক্ষার যন্ত্রের ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রকল্প আছে। এক্ষেত্রে ক্রয়ের ২৫ ভাগ বা সর্বাধিক ৩৯,০০০/- পর্যন্ত একক চাষিকে দেওয়া যায়।

খ। হাজামজা পুকুর MGNREGS-এর মাধ্যমে সংস্কার করে মাছ চাষ করার জন্য ব্যাঙ্ক ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া যায়। দলগত উদ্যোগে সমবায় তৈরি করলে ঋণ পাওয়া সহজ হয়।

গ। মাছ চাষের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রায় সারা বছর ধরেই নানা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মৎস গবেষণা সংস্থার কার্য্যালয়। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রশিক্ষণের জন্যে রাহা খরচও দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

ঘ) সরকারি তরফে মৎসজীবিদের জন্য মৎসজীবি কার্ড, আলাদা স্বাস্থ্যবীমা ও পেনশনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই সুযোগ পেতে হলে স্থানীয় পঞ্চায়েত অনুমোদনক্রমে ব্লকের ফিসারি দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হয়।

সারণী - ২

| | |
|---|---|
| ১ কাঠা | ৭২০ বর্গফুট |
| ১ বিঘা | ২০ কাঠা বা ৩৩ শতক |
| ১ একর | ১০০ শতক /৪০০০ বর্গমিটার /১৪৪০০ বর্গফুট |
| ১ হেক্টর | ২.৫ একর বা ৭.৫ বিঘা বা ১০০০ বর্গমি. বা ৩৬ হাজার বর্গ ফুট |
| ১পিপিএম | ১০০০ লিটারে ১ গ্রাম বা এক লিটারে এক মিগ্রা |
| ১ টন | ১০০০ কিগ্রা |
| ১ কুইন্ট্যাল | ১০০ কিগ্রা |
| এক কুনকে বাটি | ২৮ গ্রাম বা ২০,০০০ ডিমপোনা |
| এক বড় বাটি | ৫০,০০০- ৬০,০০০ ডিমপোনা |

**শেষের কথা**

এটা এখন সর্বজনবিদিত যে, পুকুরে ঠিক মত মাছ চাষ করতে পারলে তা সমপরিমাণ আবাদি জমি থেকে অনেক বেশি লাভজনক। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে মাছ চাষের প্রসার হওয়া দরকার কেননা এখানকার জল, মাটি, আবহাওয়া মাছের দ্রুত বৃদ্ধির অত্যন্ত সহায়ক। মাছ চাষের প্রসার ঘটলে গ্রামাঞ্চলে আনুষঙ্গিক একটা বাজারও গড়ে উঠবে যেমন 'Aqua Shop' জাতীয় দোকান বা Aqua Service Centre বিভিন্ন গ্রামে তৈরি হলে কাজের সংস্থান ও আবহাওয়া তৈরি হবে। সেখান থেকে মাছের খাবারের উপাদান তৈরি করার সামগ্রী চুন, জৈবসার, মাছ ধরার জাল, প্ল্যাঙ্কটন নেট, থার্মোমিটার, পি এইচ মাপার চার্ট পেপার, পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট, ভিটামিন মিনারেল মিক্সচার ইত্যাদি পাওয়া যাবে এবং এইসব সম্পদ কর্মীর সহায়তায় একটা সুসংগঠিত উদ্যোগ দেখা যাবে যা গ্রামের সমৃদ্ধির সহায়ক হবে এবং স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে স্বাবলম্বী হতে পারবেন যা গ্রামীণ বিকাশে একান্তই কাম্য।

মাছ চাষের উন্নয়নের জন্য Marine Products Export Development Authority (MPEDA)-র কোলকাতায় অবস্থিত আঞ্চলিক কার্য্যালয় থেকে বিভিন্ন ধরণের অনুদানের ব্যবস্থা করে থাকেন। (ভারত সরকারের বাণিজ্য ও উদ্যোগ মন্ত্রণালয়, P-161/1 VIP Road, 4th floor, Ultadanga, Kolkata 700 054, (calmpeda@vsnl.net)

মিষ্টি ও নোনাজলের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র – যা মাছ চাষের জন্যে আদর্শ জায়গা। সাধারণত সুন্দরবনের নদী, খাল, মোহনা নদী সংলগ্ন নীচু জলাভূমি এলাকা হল নোনা জলের মাছ ও চিংড়ি বীজ পাওয়ার প্রাকৃতিক উৎস। শুক্লপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষের ভরা কোটালের সময়ে ৫–৬ দিন এইসব মোহনা এলাকায় জোয়ারের শক্তি ও বেগ বেশি থাকে। তাই ওই সময়ে বিভিন্ন জালের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে মাছ ও চিংড়ির বীজ এইসব এলাকা থেকে পাওয়া যায়। নোনা জলে মাছ ও চিংড়ি চাষ এককভাবে বা মিশ্রভাবে করা যায়। নোনা জলের এলাকায় লবণতার ভাগে নিত্য পরিবর্তন ঘটে থাকে। গরমকালে জলে লবণতার ভাগ বেশি মাত্রায় থাকে, আবার বর্ষার সময়ে জলে লবণতার ভাগ অনেক কমে যায়। মিষ্টি জলের সংমিশ্রণের ফলে তাই ওই সময়ে ওই জলে মিষ্টি জলের মাছ চাষও খুব ভালো হতে পারে।

সারণী - ৭

## নোনাজলে চাষযোগ্য কিছু মাছ ও চিংড়ি

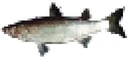

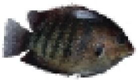

পারসে : লিজা পারসিয়া *(Liza parsia)*

ভাঙন : লিজা টাডে *(Liza tade)*

আধ ভাঙন : মিউজিল সেফালাস *(Mugil cephalus)*

রাম পারসে : লিজা ম্যাকরোলেপিস *(Liza macrolepis)*

তেল চাপটি : চ্যানস চ্যানস *(Chanas chanos)*

নোনাচাঁদা : এট্রোপ্লাস সুরাটেনসিস *(Etroplus suratensis)*

পায়রাতালি : স্ক্যাটোফিগাস আরগাস *(Scatophagus argus)*

ভেটকি : ল্যাটেস ক্যালকেরিফার *(Lates calcarifer)*

গুরজাওলি : এ্যালিওথেরোনিসা টেট্রাডাইটাইলাস *(Eleutheronema tetradactylum)*

বাগদা : পিনিয়াস মোনোডন *(Penaeus monodon)*

চাপড়া : পিনিয়াস ইনডিকাস *(Penaeus indicus)*

## সংগঠন কথা

ডিআরসিএসসি ১৯৮২সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের নানা জায়গায় উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছে। সংগঠনের লক্ষ্য, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র–প্রান্তিক–ভূমিহীন কৃষকের খাদ্য ও কাজের জোগান সুনিশ্চিত করা। যে লক্ষ্যের পথ হবে সামাজিক ন্যায়–নির্ভর, সহভাগী, পরিবেশ–বান্ধব ও অর্থনৈতিক ভাবে উপযুক্ত।

কাজের পরিধি

১. সহভাগী প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে খাদ্য–গোখাদ্য–জ্বালানির জোগান সুনিশ্চিত করার পরিকাঠামো গড়ে তোলা।
২. দরিদ্র, বিশেষত অবহেলিত অংশের মানুষকে সংগঠিত করা ও দলগতভাবে ‘সামূহিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা’।
৩. জলবায়ু বদল মোকাবিলা–প্রশমনে কার্যক্রম ও জলবায়ু বদল নিয়ে সচেতনতা প্রসার – গবেষণা সহযোগ।
৪. শিক্ষক, শিক্ষা সহায়ক ও কিশোদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা ও বিকল্প আয়ের সুযোগ তৈরি।
৫. উন্নয়নের নানা বিকল্প ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো।
৬. তৃণমূল স্তরে ছোট ছোট সংগঠন গড়ে তোলা ও বর্তমান সংগঠনগুলির দক্ষতা বাড়ানো।
৭. উন্নয়ন নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের জন্য তথ্য পরিষেবা।